নেহরীন খান স্মৃতি বক্তৃতা
ও
সম্মাননা অনুষ্ঠান ২০২৬

১২ জুলাই ২০২৬, রবিবার, সকাল ১১:০০ মিনিট
মঞ্জুর এলাহী অডিটোরিয়াম
ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা-১২১২

ট্রাস্ট দলিল

নেহরীন খান স্মৃতি তহবিল, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি

প্রতিষ্ঠাকাল ঃ ৩০ জানুয়ারী ২০১৭

নেহরীন খান স্মৃতি তহবিলের উদ্দেশ্য ঃ

প্রতি বছর প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে গঠিত একটি নির্বাচনী কমিটির মাধ্যমে একজন সাহিত্যিককে তার অবদানের স্বীকৃতির জন্য নির্বাচন করে সম্মাননা প্রদান করা হবে এবং তাকে নেহরীন খান স্মৃতি বক্তৃতা দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। তার বক্তৃতা ছাপানো হবে এবং সভাস্থলে বিতরণ করা হবে। নির্বাচিত সাহিত্যিককে কমপক্ষে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা ও একটি ক্রেস্ট প্রদান করা হবে।

ট্রাস্টি বোর্ড, নেহরীন খান স্মৃতি তহবিল ঃ

০১.	**এয়ার কমোডর ইসফাক ইলাহী চৌধুরী (অবঃ)** কোষাধ্যক্ষ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।	সভাপতি
০২.	**জনাব কবির উদ্দিন খান** দাতা কর্তৃক মনোনীত	সদস্য
০৩.	**ড. ফারজানা আক্তার** অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ ও ডীন, ফ্যাকাল্টি অব লিবারেল আর্টস এন্ড স্যোশাল সায়েন্সেস, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।	সদস্য
০৪.	**জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম খান** চীফ, মানব সম্পদ ও লজিস্টিকস্ বিভাগ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।	সদস্য সচিব

নেহরীন খান স্মৃতি বক্তৃতার সম্মানিত বক্তা নির্বাচনী কমিটি ঃ

০১.	**অধ্যাপক ড. ফকরুল আলম** অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সাবেক উপ-উপাচার্য, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।	সভাপতি
০২.	**জনাব কবির উদ্দিন খান** দাতা কর্তৃক মনোনীত	সদস্য
০৩.	**ড. ভীষ্মদেব চৌধুরী** অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
০৪.	**জনাব মোঃ সাজ্জাদ শরীফ** নির্বাহী এডিটর, দৈনিক প্রথম আলো।	সদস্য
০৫.	**অধ্যাপক ড. ফওজিয়া মান্নান** চেয়ারপার্সন, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।	সদস্য
০৬.	**এয়ার কমোডর ইসফাক ইলাহী চৌধুরী (অবঃ)** কোষাধ্যক্ষ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।	সদস্য

এক নজরে নেহরীন খান স্মৃতি বক্তৃতা ও সম্মাননা অনুষ্ঠান ঃ

ক্র. নং	সম্মানিত বক্তা	বিষয়	তারিখ
০১.	**ড. এ. এফ. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী** এমিরেটাস অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	মানা এবং না-মানার প্রশ্ন	১২ জুলাই ২০১৭
০২.	**ড. সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম** ভূতপূর্ব অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সাহিত্য ও সমাজে নিম্নবর্গীয়তা ঃ বৃত্তের ভেতরে জীবন	৪ ডিসেম্বর ২০১৮
০৩.	**ড. ফকরুল আলম** ভূতপূর্ব অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	THE IDEA OF A UNIVERSITY IN OUR TIME	২৫ জুলাই ২০১৯
০৪.	**সেলিনা হোসেন** একুশে ও স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত কথা সাহিত্যিক ও সভাপতি, বাংলা একাডেমি।	সাহিত্যের ভুবনে লেখকের পথচলা	২৬ জুলাই ২০২২
০৫.	**ড. দীপেশ চক্রবর্তী** লরেন্স এ. কিম্পটন ডিস্টিংগুইশড সার্ভিস প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ দি ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	THE PLANETARY AGE IN HUMAN HISTORY	৫ মার্চ ২০২৩
০৬.	**অধ্যাপক রেহমান সোবহান** সভাপতি, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)	CONSTRUCTING A MORE JUST SOCIETY IN BANGLADESH	২৭ নভেম্বর ২০২৪
০৭.	**ড. নিয়াজ জামান** অবরসপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	LITERARY TRANSLATIONS AND TRANSLATORS: BANGLADESH AND BEYOND	১৬ জুলাই ২০২৫
০৮.	**অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন** সভাপতি, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ও সাবেক গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক	সাংবিধানিক সংস্কার ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত	১২ জুলাই ২০২৬

Nahreen Khan Memorial Bursary, East West University তহবিল ঃ

নেহরীন খান স্মৃতি তহবিল, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির উদ্যোগে নেহরীন খান এর প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ইংরেজী বিভাগের এক বা একাধিক শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদানের জন্য ২৭ আগস্ট ২০১৯ তারিখে Nahreen Khan Memorial Bursary, EWU নামক তহবিল গঠন করা হয়। উক্ত তহবিলে অনুদান প্রদানকারীদের তালিকা নিম্নরূপ ঃ

ক্র. নং	অনুদান প্রদানকারীর নাম	পরিমাণ (টাকা)
০১	**অধ্যাপক ড. ফকরুল আলম** সাবেক উপ-উপাচার্য, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা ও নেহরীন খান- এর শিক্ষক।	১,০০,০০০/-
০২	**ড. আকবর আলি খান** সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও নেহরীন খান- এর বাবা।	১,০০,০০০/-
০৩	**সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী** সভাপতি, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি , ঢাকা ও চেয়ারম্যান, এ্যাপেক্স গ্রুপ।	১,০০,০০০/-
০৪	**অধ্যাপক ড. দীপেশ চক্রবর্তী** লরেন্স এ. কিম্পটন ডিস্টিংগুইশড সার্ভিস প্রফেসর ইতিহাস বিভাগ, দি ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সম্মানিত বক্তা, নেহরীন খান স্মৃতি বক্তৃতা ২০২৩	১,০০,০০০/-
০৫	**অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন** সভাপতি, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ও সাবেক গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক	১,০০,০০০/-

নেহরীন খান স্মৃতি বক্তৃতা ও সম্মাননা অনুষ্ঠান ২০২৬

বিষয় ঃ সাংবিধানিক সংস্কার ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

অনুষ্ঠানসূচী

সকাল ১১:০০ মিনিট	ঃ	অতিথিদের আসন গ্রহণ
সকাল ১১:০৫ মিনিট	ঃ	স্বাগত বক্তব্য ও সম্মানিত বক্তার পরিচিতি **ড. ফকরুল আলম** অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা সভাপতি, বক্তা নির্বাচনী কমিটি নেহরীন খান স্মৃতি বক্তৃতা ও সম্মাননা অনুষ্ঠান সাবেক উপ-উপাচার্য, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা
সকাল ১১:১৫ মিনিট	ঃ	সম্মানিত অতিথির বক্তব্য **অধ্যাপক শামস্ রহমান** উপাচার্য, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা
সকাল ১১:২৫ মিনিট	ঃ	মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন **অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন** সভাপতি, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ও প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ও সাবেক গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক
দুপুর ১১:৫৫ মিনিট	ঃ	প্রধান অতিথির বক্তব্য **ড. শাহদীন মালিক** বিশিষ্ট সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও জ্যেষ্ঠ আইনজীবী বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
দুপুর ১২:২০ মিনিট	ঃ	সম্মাননা প্রদান
দুপুর ১২:২৫ মিনিট	ঃ	ধন্যবাদ জ্ঞাপন **এয়ার কমোডর ইসফাক ইলাহী চৌধুরী (অবঃ)** কোষাধ্যক্ষ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা ও সভাপতি, ট্রাস্টি বোর্ড, নেহরীন খান মেমোরিয়াল ফান্ড
দুপুর ১২:৩০ মিনিট	ঃ	আপ্যায়ন

নেহরীন খান পরিচিতি

নেহরীন খান
(১৯৭৭-২০১৬)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব ড. আকবর আলি খান ও হামীম খানের একমাত্র সন্তান নেহরীন খান ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ১২ জুলাই তারিখে কানাডার কিংস্টন শহরের জেনারেল হাসপাতালে জন্ম গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, ঐ সময়ে তার পিতা কিংস্টনের কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি ডিগ্রীর জন্য পড়াশোনা করেছিলেন।

শিক্ষা জীবন ঃ

নেহরীন খান ১৯৭৯ সালে মা-বাবার সাথে দেশে ফিরে আসেন। ১৯৮০ সালে তিনি কাকরাইলে উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু স্কুল তার মোটেও ভালো লাগত না। ক্লাসরুমে যাওয়ার পরেই তিনি তার মায়ের জন্য কান্নাকাটি শুরু করে দিতেন। ১৯৮১ সালে তাকে ধানমন্ডির সানবীমস স্কুলে ভর্তি করা হয়। তার মা সেসময় সানবীমস স্কুলে অঙ্কের শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। মা স্কুলে থাকার ফলে সানবীমসে সে আর কান্নাকাটি করত না। ১৯৮৭ সালে তার বাবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দুতাবাসে ইকোনমিক মিনিস্টার পদে বদলি হন। নেহরীন মন্টগোমারি কাউন্টিতে বেভারলি ফার্মস স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। এরপর পোটোম্যাকের হার্বার্ট হুভার নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আরও দুই বছর লেখাপড়া করেন। ১৯৯১ সালে তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন। ঢাকায় ফিরে 'ও' লেভেল এবং 'এ' লেভেল পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। এসব পরীক্ষার ফল ভালো হয়নি। কিন্তু তার মায়ের ধারণা ছিল যে তার মেয়ে তার মতোই মেধাবী। সুতরাং সে একজন বিজ্ঞানী হবে এবং খুব সহজেই বিজ্ঞান বিষয়ে সে 'ও' লেভেল এবং 'এ' লেভেল পাস করবে। কিন্তু তার মা একটি বড় ভুল করেছিলেন। নেহরীনের বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহ ছিল না। সে গল্প শুনতে পছন্দ করত। ইতিহাস পড়ায় তার আগ্রহ ছিল। সাহিত্যের বদলে বিজ্ঞান চাপিয়ে দেওয়াটাকে সে সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। তবু সে তার মায়ের দাবী পূরণ করার চেষ্টা করত। তার পিতা তাকে জোর করে বিজ্ঞান পড়ানোর বিরোধী ছিলেন। এমনকি তিনি তাকে ইংরেজী মিডিয়ামে পড়াতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন সে বাংলা মিডিয়ামে ভিকারুননিসা নূন স্কুলে দেশের অন্য ছেলেমেয়েদের মতো লেখাপড়া করুক। কিন্তু তার মা এতে মোটেও রাজী ছিলেন না। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, বাংলা মিডিয়ামের মান নিচু। হয়তো তার মায়ের বক্তব্য সঠিক কিন্তু এতে নেহরীনের একটি বড় লোকসান হয়ে যায়। বাংলা মিডিয়ামে পড়লে তার অনেক বন্ধু

হতো কিন্তু ইংরেজী মিডিয়ামে পড়তে গিয়ে সে তার প্রজন্মের ছাত্র ছাত্রীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত যখন প্রমাণিত হলো যে নেহরীনের পক্ষে বিজ্ঞান পড়া সম্ভব নয়, তখন তাকে নবপ্রতিষ্ঠিত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ইংরেজী বিভাগে ভর্তি করা হয়। ইংরেজী সাহিত্যে স্নাতক ডিগ্রী অর্জনের শেষ পর্যায়ে নেহরীন খানের বাবা বিশ্বব্যাংকে বিকল্প নির্বাহী পরিচালক পদে মনোনীত হন। সে বাবার সঙ্গে আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে ওয়াশিংটনে আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে (The American University at Washington D.C) ভর্তি হয় এবং ২০০৫ সালে ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে বিএ ডিগ্রী অর্জন করে। এরপর সে দেশে ফিরে আসে এবং পুনরায় ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে সেখান থেকে ইংরেজী সাহিত্যে এম.এ ডিগ্রী অর্জন করে।

কর্মজীবন ঃ

নেহরীন খান ২০০৭ সালে প্রেসিডেন্সী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। এক সেমিস্টার পড়ানোর পর তিনি ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ (ইউডা) তে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন এবং কিছুদিন পর সহকারী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। ২০১৬ সনে তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়েই অধ্যাপনার সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি ভিক্টোরিয়ান সাহিত্য, রোমান্টিক সাহিত্য ও শেক্সপিরিয়ান সাহিত্য পড়াতেন।

জীবনের ছোট গন্ডি ঃ

ড. আকবর আলি খান ও হামীম খানের একমাত্র সন্তান তার আত্মজীবনের খসড়াতে লিখেছেন, 'My parents also doted on me but now as I remember my childhood I think I was being protected as well as spoilt. I had no friends at that age. My friends were my grandparents, my father and my mother.' বয়স বাড়লে সে তার নিজের পরিবারেই নিজের বয়সী বন্ধুদের খুঁজে পায়। তার বন্ধু ছিল তার মা হামীম খানের খালাতো বোন লিনেটের মেয়ে ফারাহ। হামীম খানের মামা মাহমুদ হাসান (যিনি অগ্রণী ব্যাংকের এজিএম ছিলেন)। তার দুই মেয়ে টুইংকেল ও টিনা এবং হামীম খানের মেজ মামা শামসুল আলম (যিনি ছিলেন চট্টগ্রামের চা ব্যবসায়ী) এর মেয়ে নীলা ছিল তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এ ছাড়া প্রতি বছর তার বাবার ছোট ভাই জসীম এক মাসের জন্য ছুটিতে তার দুই মেয়ে জারা ও জেবাকে নিয়ে ঢাকায় বেড়াতে আসত। তাছাড়া ঢাকায় ছিল তার বাবার ছোট ভাই কবীরের বড় মেয়ে তিথি। তারা একসঙ্গে খেলত। তবে পরিবারের বাইরে নেহরীনের কোন বন্ধু বান্ধব ছিল না।

সারা জীবনই নেহরীন তার মা ও বাবাকে তার সবচেয়ে বড় বন্ধু বলে মনে করত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালীন তার বাবা প্রতিদিন তাকে সকালে স্কুলে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যেতেন এবং রাতে ক্লাস থাকলে মেয়েকে নিয়ে বাড়ী ফিরতেন। একবার ওয়াশিংটনে গুপ্ত ঘাতকের প্রকোপ দেখা দেয়। ওই সময়ে নেহরীনের পিতা সব সময় তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যেতেন এবং নিয়ে আসতেন। একবার তারা যখন বাসায় ফিরছিলেন, তখন পুলিশ তাদের সামনে দিয়ে ঘাতকের গাড়ী তাড়িয়ে নিয়ে যায়। নেহরীন তার বাবার সাহচার্য খুবই পছন্দ করত। যেদিন তিনি মারা যান, সেদিন সকালে তিনি তার পিতার কপালে হাত দিয়ে আশির্বাদ করছিলেন। তার পিতা তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন কি হয়েছে মা? তিনি জবাবে বলেছিলেন যে তার পিতা সজাগ আছে কিনা সেটা দেখছেন। তার মৃত্যুর পর তার পিতার মনে হয় সে তার বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেছে।

বিশ্বাস ঃ

নেহরীনের বিশ্বাস ছিল, তার মা তাকে যে কোন বিপদ বা অকল্যাণ থেকে রক্ষা করবেন। ছোটবেলায় তাকে একটি গল্প শোনানো হতো, গল্পটি ছিল এ রকম- একটি হাতির বাচ্চাকে দুষ্টু লোকেরা চুরি করে। নেহরীন এ গল্প বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে। সঙ্গে সঙ্গে সে প্রশ্ন করে, 'হাতির মা কী করল?' তার বিশ্বাস ছিল যে হাতির বাচ্চার মা-বাবা নিশ্চয়ই তাকে রক্ষা করবে। এ ধারণাটি অবশ্যই ভুল ছিল। নেহরীন তার জীবন দিয়ে শিখে গেল বাবা-মা সব সময় তার সন্তানকে রক্ষা করতে পারে না।

নেহরীন খান তার স্বল্পস্থায়ী জীবনে তিনটি বিষয়ে গবেষণা করেছেন। প্রথম বিষয়টি হলো ইংরেজীতে যাকে বলে Home বাংলায় যাকে বলা যেতে পারে ঘর। নেহরীন সারা জীবনই ঘর খুঁজে বেড়িয়েছে। জন্ম তার কানাডায়। প্রায় দেড় বছর বয়সে কানাডা থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসে। আবার দশ বছর বয়সে চার বছরের জন্য পিতার

তৎকালীন কর্মস্থল আমেরিকায় চলে যায়। চার বছর আমেরিকায় থাকার পর দেশে ফিরে এসে একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী শেষ করার আগে আবার ২০০২ সালে তিন বছরের জন্য পিতার কর্মস্থল আমেরিকাতে যায় এবং বছর তিনেক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকে। বাংলাদেশ, কানাডা এবং আমেরিকায় বারবার যাওয়া আসার ফলে তার অভিবাসী সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ জন্মে। ভারতী মুখার্জী, ঝুম্পা লহিড়ী, মণিকা আলী প্রমুখ ছিল তার প্রিয় লেখক। অভিবাসীদের সত্তাসংকট বা Identity crisis ছিল তার আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির গবেষণার বিষয়। নেহরীন খান লক্ষ্য করেন যে অভিবাসীদের মধ্যে ঘরে ফেরার একটি প্রচন্ড ঝোঁক রয়েছে কিন্তু অর্থাভাবে তারা কম বয়সে দেশে ফিরতে পারে না। যখন তাদের অর্থাভাব দুর হয়, তখন তারা দেশে ফিরতে চায়; কিন্তু দেশে ফিরে দেখতে পায়, যে দেশ ছেড়ে তারা গিয়েছিল সে দেশ আর নেই। কালের বিবর্তনে সে দেশ হারিয়ে গেছে এবং এখন যে দেশ, সে দেশকে তারা চিনে না। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন,

"The immigrants imagine that their old homes is like Keats's Grecian Urn where nothing changes. The returning immigrants discover to their utter surprise that their dear and near ones have either passed away or changed. The new inhabitants in their homeland are unknown. The homeland that is vivid in their mind does not exist any longer."

তার গবেষণার দ্বিতীয় বিষয় ছিল মোনালিসা। ১৯৯৮ সালে নেহরীন তার পিতার সঙ্গে প্যারিস ল্যুভ জাদুঘরে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির মোনালিসা ছবি দেখতে যায়। ছবিটি দেখার পর তিনি লিখেনঃ

"One thing that struck me as I looked on was how alive and real she looked. This picture portrays an actual woman of flesh and blood. She had lustrous almond shaped eyes with a watery sheen on them. She had quite visible eyebrows and eyelashes. It was so clear a picture that even the hair ends from her forehead could be seen. She looks so much alive that she seems to look back at the onlooker. Even the shadow of her nose was visible and the fleshy inside of her nostrils were visible. Her lips curved into a pleasing smile though her face wore a melancholy look. Leonardo da Vinci copied every little detail and every little line bring the portrait to life."

মোনালিসাকে নিয়ে গবেষণা করতে করতে তিনি তার ঘরের মধ্যেই এক দোসর খুঁজে পান। এ দোসরের নাম লিপি। লিপি তার ফুফাতো বোন। সে কানে শুনত না এবং কথা বলতে পারত না। অথচ সে সুন্দরী ও চটপটে ছিল এবং জীবনকে ভালবাসত। তাকে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তার একটি ছেলে ও একটি মেয়ে হয়েছিল। কিন্তু স্বামী, ছেলে মেয়ে কারোর সঙ্গেই তার পুরোপুরি সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মোনালিসার সঙ্গে তুলনা করে সে লিখেছে ঃ

"Mona Lisa has a smile like her but Mona Lisa does not say anything and she is just a painting. But my cousin is a real human being. Mona Lisa will always remain smiling and she can never change her expression but my cousin can

because she is capable of all emotions and can express them all. I dreamt of speaking to Mona Lisa because it is easy to do so but it is not all easy to dream of speaking to Lipi. I wanted to hear Mona Lisa's voice and I did in my dreams but I cannot hear my cousin speak. I would do anything to make her a full sentence."

তার অসমাপ্ত নোটগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সে মোনালিসা, লিপি ও হেলেন কেলারকে নিয়ে একটি গল্প লেখার চেষ্টা করছিল। তিন নায়িকা সম্বন্ধেই আলাদা আলাদাভাবে অনেক কিছুই লিখেছে। এগুলো একত্র করলে হয়তো একটি সুন্দর গল্প রচিত হতে পারত।

নেহরীনের তৃতীয় গবেষণার বিষয় ছিল ভারতে মহিলাদের অবস্থান। তিনি শুধু ভারতীয় মহিলাদের আর্থিক দুরবস্থা নিয়েই চিন্তিত ছিলেন না. তাদের সামাজিক দুরবস্থা নিয়েও তিনি অনেক বেশী চিন্তিত ছিলেন। এ জন্য প্রয়োজন মহিলাদের চেতনার সম্প্রসারণ। এ সম্পর্কে লেখার জন্য তিনি আরও পড়াশোনা করছিলেন। নেহরীন খান কোন গবেষণাই শেষ করে যেতে পারেননি। তবে তার লেখার জন্য যেসব নোট করেছিলেন, তা পড়লে বোঝা যায় তার অনেক সুন্দর লেখার সম্ভাবনা ছিল। এ লেখাগুলো পড়লে রবীন্দ্রনাথের উক্তি মনে পড়ে ঃ

> 'যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে
> যে নদী মরু পথে হারালো ধারা
> জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।'

সম্মানিত বক্তার সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত

অধ্যাপক মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন ১৯৪০ সনের ০৬ই জুন মোতাবেক ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭ তারিখে হবিগঞ্জ জেলাধীন মাধবপুর উপজেলার রতনপুর গ্রামের একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা মরহুম মোহাম্মদ মাহতাবউদ্দিন মাতা মরহুম চমকচান।

আজীবন মেধাবী মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন পিতা প্রতিষ্ঠিত রতনপুর প্রাইমারী স্কুল থেকে ১৯৫০ সনে দ্বিতীয় শ্রেণী ও তিন মাইল দূরে জগদীশপুর হাইস্কুল থেকে ১৯৫৩ সনে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর লেখাপড়া শেষ করেন। ১৯৫৮ সনে সিলেট সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক বা প্রবেশিকা এবং ১৯৬০ সনে সিলেট এম সি কলেজ থেকে আইএসসি পাশ করেন। উভয় পরীক্ষাতেই সম্মিলিত মেধা তালিকায় স্থান করে নিয়েছিলেন।

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৩ সনে অর্থনীতিতে সম্মানসহ বিএ এবং ১৯৬৪ সনে এম.এ ডিগ্রী লাভ করেন; দুবারই তিনি প্রথম স্থান লাভ করেন। পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রের বস্টন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৮ সনে অর্থনীতি ও রাজনৈতিক অর্থনীতি বিষয়ে দু'টো এম.এ ডিগ্রী অর্জন করেন এবং ১৯৭৯ সনে কস্ট-বেনিফিট অ্যানালাইসেস বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন- তার তিনজন সুপারভাইজার ছিলেন পেরুর প্রফেসর ড্যানিয়েল শিডলস্কী, ইংল্যান্ডের প্রফেসর রবার্ট লুকাস ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রফেসর গুস্টভ পাপানেক।

পঞ্চাশ বছরের কর্মজীবনের শুরুতে মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন ১৯৬৪-৬৬ এই আড়াই বছর আহসানউল্লাহ ইঞ্জিঃ কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে প্রভাষক হিসাবে কাজ করেন। ১৯৬৬ সনে তদানীন্তন পাকিস্তানের সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষায় মেধা তালিকায় স্থান করে নিয়ে সিএসপি ক্যাডারে যোগদান করেন। জামালপুরের (১০টি থানা ২০ লক্ষ লোক, বর্তমানে দু'টো জেলায় বিভক্ত) মহকুমা প্রশাসক, রাজশাহীর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক ও করাচীর অতিরিক্ত কমিশনার হিসাবে মাঠ পর্যায়ে কর্ম অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হন মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন। ইহা ছাড়াও তিনি কয়েকটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চেয়ারম্যান অথবা পরিচালক হিসাবে কাজ করেন। তদানীন্তন ব্রিটিশ টোব্যাকো কোম্পানীতে সরকার মনোনীত পরিচালক হিসাবে এ কোম্পানীতে দেশের স্বার্থ এবং বাংলাদেশী কর্মকর্তাগণের জন্য বিদেশীদের সঙ্গে তুলনীয় সুযোগ সুবিধা আদায় করেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সাথেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কন্ট্রোলার অব ক্যাপিটাল ইস্যুজ হিসাবে কাজ করার সময় আশির দশকের শুরুতে ব্যাংক ও বীমা খাতকে ব্যক্তিখাতে

উন্মুক্ত করে দেয়ার নীতি নির্ধারণে এবং বাস্তবায়নের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ও ইতিবাচক ভূমিকা রাখেন। একই সময়ে অর্থ বিভাগের যুগ্মসচিব (বিনিয়োগ ও ব্যাংকিং) হবার সুবাদে গ্রামীন ব্যাংক অধ্যাদেশ ১৯৮৪ প্রণয়নে একজন মূল চালিকাশক্তি ছিলেন মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন।

১৯৯৮-২০০১ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর হিসাবে অনেক সংস্কারের কাজ শুরু করেন। ঋণখেলাপকে সামাজিক সন্ত্রাস হিসাবে ঘোষণা করে শক্তিধর ৫৭ জন ঋণখেলাপীদের শাস্তি প্রদান, মানি লন্ডারিং এর অপকর্মে জড়িত বিদেশীসহ শীর্ষস্থানীয় ৩৭জন ব্যাংক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, নিজ ব্যাংক থেকে মালিক পরিচালকগণের আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে ঋণ গ্রহণ বন্ধ করা, শুধুমাত্র রাজনীতির কারণে ব্যাংকের বেতনভুক উপদেষ্টার পদ গ্রহণ নিষিদ্ধ করা, ব্যাংক মালিক পরিচালক বনাম ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দ্বন্দ্ব ও বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যাতিরেকে ব্যবস্থাপনার শীর্ষ কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও পদচ্যুতি বন্ধ করে সুস্থ, সবল, দক্ষ ও স্বচ্ছ ব্যাংক ব্যবস্থাপনার সুচনা করেন। কেন্দ্রীয় ব্যাংকে মেধা আকর্ষন ও মেধাবীদের ধরে রাখার বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন গভর্ণর ফরাসউদ্দিন। তার সময়ে মূল্যস্ফীতি শতকরা ০২ (দুই) শতকের নীচে রাখা সম্ভব হয়েছিল। মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনের সময় খেলাপী ঋণ শতকরা ২০ (বিশ) ভাগ কমিয়ে ৪০০০ কোটিতে নামানো হয়েছিল। তিনি সামষ্টিক অর্থনীতির সাথে মুদ্রানীতির অর্থবহ সমন্বয় প্রদানে গবেষণার উৎসাহ প্রদান মানসে ২০০১ সনে অর্থনীতিতে বাংলাদেশ ব্যাংক পুরস্কারের প্রচলন করেন; এর প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রফেসর রেহমান সোবহান। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জন্য আলাদা বেতন স্কেল অর্জনের অসমাপ্ত প্রচেষ্টায় শক্তিশালী অবস্থান নেন ডঃ মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন।

২০১৩-১৪ সময়ে ডঃ মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন বাংলাদেশের জাতীয় বেতন ও চাকরী কমিশনের চেয়ারম্যান (সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের বিচারপতির পদমর্যাদায়) হিসাবে সরকারী কর্মকর্তাগণের বেতন দ্বিগুণ করার সুপারিশ করে যথাসময়ে প্রতিবেদন জমাদান করেন। তবে ২০১৬ সনে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ ডাকাতির বিষয়ে তার চাঞ্চল্যকর তথ্য সুপারিশ সরকার প্রকাশ করেনি। ডঃ মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন ১৯৮৫- ১৯৯৬ সময়ে আন্তর্জাতিক মেধা প্রতিযোগিতায় সফল হয়ে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী ইউএনডিপির তিনটি দেশে প্রথমে উপ-আবাসিক প্রতিনিধি ও পরবর্তীতে আবাসিক প্রতিনিধি হিসাবে সফলতার সাথে কাজ করেন। এ সময় মাথাপিছু আয়ের বদলে টেকসই মানব উন্নয়ন সূচকের মাপকাঠি হিসাবে রিচার্ড জলি মাহাবুবুল হক প্রণীত হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স (এইচ ডি আই) নামে উন্নয়নের মান মাপের বিকল্প পন্থার উদ্ভব প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত ছিলেন ডঃ মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন।

ইহা ছাড়াও ডঃ মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল ও ঢাকা সিটি কলেজের ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত থাকেন। ছোট বেলা থেকেই গ্রামে ও শহরে বিভিন্ন শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক কর্মকান্ডে তিনি অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য ডঃ মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন এখন ইহার বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি। ডঃ মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন একাধিকবার শীর্ষস্থানীয় উন্নয়ন পর্যালোচনা সংস্থা বিআইডিএস এর নির্বাচিত সিনিয়র ফেলো এবং ইহার বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটির এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য এবং সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

ডঃ মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনের অর্থনীতিতে প্রায় ২৫ (পঁচিশ) বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা রয়েছে যার মধ্যে আইবিএ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খন্ডকালীন ভিজিটর প্রফেসরশীপ অন্যতম।

তবে কর্মজীবনে মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন সুবর্ণ সময় ১৯৭৩-৭৫ সময়ে জাতির জনক বঙ্গঁবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একান্ত সচিব হিসাবে প্রথমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে কাজ করে একটি

কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে অনেক কর্মকান্ডের সূচনা প্রত্যক্ষ করে হাতে কলমে ব্যবহারিক শিক্ষা লাভ করেন।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির একজন অত্যন্ত আশাবাদী বিশ্লেষক এ বিষয়ে গবেষণা ও বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখি এবং আলোচনা করে প্রশংসিত হয়েছেন ডঃ ফরাসউদ্দিন। তিনি বাংলাদেশের পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দলিলের মূল্যায়ন কমিটির সদস্য ছিলেন। শামসুল হক শিক্ষা কমিটির (১৯৯৭) একজন নেতৃস্থানীয় সদস্য হিসাবে কুদরত-এ-খুদা কমিশনের মূল সুপারিশের অনুসরণে মাতৃভাষায় একমুখী শিক্ষা এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক প্রচলনের বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করান। ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দলিল প্রণয়নের পূর্বে জাতীয় অগ্রগতির দিকদর্শনমূলক বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনার (২০১১-২১) পরামর্শক কমিটির সদস্য হিসাবে ডঃ মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নে তার মৌলিক চিন্তা রয়েছে; এ সম্পর্কে বিভিন্ন উদ্যোগ, যথা অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল, উচ্চশিক্ষা কমিশন, উচ্চশিক্ষায় মৌলিক পরিবর্তনকারী কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে ডঃ মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন বিশেষভাবে সম্পৃক্ত।

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন বঙ্গঁবন্ধু স্মারক বক্তৃতা (২০১১), শাহ মোহাম্মদ শামসুল কিবরিয়া স্মারক বক্তৃতা (২০১০), বিআইবিএম এর নূরুল মতিন স্মারক বক্তৃতা (২০১১ এথিকস ইন ব্যাংকিং), প্রফেসর মোজাফফর আহমেদ স্মারক বক্তৃতা (২০১২), ইঞ্জিনিয়ার এম এ জব্বার স্মারক বক্তৃতা (২০১৪) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৩তম জন্মদিবস ১লা জুলাই ২০১৪ সনে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় উচ্চশিক্ষার ভূমিকাসহ গবেষণাধর্মী একটি নিবন্ধ পেশ করেন। ২১-২২ জুন ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ ইকনমিস্টস ফোরামের প্রথম সম্মেলনে তিনি "বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় অবাকাঠামো প্রতিবন্ধকতা" শীর্ষক নিবন্ধ পেশ করেন। ডঃ মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনের গণতন্ত্রের পথেই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি (২০০৫), প্রথম দর্শনে বঙ্গঁবন্ধু (২০০৯) ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লব (২০২২) এবং বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় আগামীর করণীয় (২০২৪) নামে পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ান একাডেমী অব বিজনেস লিডারশীপ পদক, বাংলা একাডেমী ফেলোশিপ, বিআইডিএস-বণিক বার্তা পদক, কবি সরোজিনি নাইডু স্বর্ণপদক, মার্কেন্টাইল ব্যাংক পুরস্কার, সিলেট রত্ন পদক ও খান বাহাদুর আহসানউল্লাহ স্বর্ণপদক, এমটিসি গ্লোব্যাল এর ৮ম বিশ্ব শিক্ষা সামিট এর লাইফ টাইম এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছেন ডঃ মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন। তবে তিনি কোন সরকারী পদ বা অনুরূপ কোন সরকারী সুবিধা প্রাপ্ত নন।

জনাব মোহাম্মদ ফরাউদ্দিন সর্বসম্মতিক্রমে ১লা জানুয়ারী ২০১৭ ইং তারিখ থেকে চার বছরের জন্য আন্ডার সেক্রেটারী জেনারেল পদমর্যদায় জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক সিভিল সার্ভিস কমিশনের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। জনাব মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনের এ নিয়োগে আন্তর্জাতিক বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে।

ডঃ ফরাসউদ্দিন এ বিশ্বাসে অটল রয়েছেন যে একটি আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক, প্রযুক্তিনির্ভর, প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গণতন্ত্রের পথেই দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং তন্মধ্যে সন্নিবিষ্ট সুষম বিতরণ ব্যবস্থাধীনেই কাঙ্খিত মানব উন্নয়ন সূচকে মধ্যম ধাপে পৌঁছে যাবে আগামী দেড় দশকে। ২০৩৫ সন নাগাদ বাংলাদেশ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতির দেশ হবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্বাধীনতার মূলতন্ত্র তথা রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক মুক্তিও ইহার সামাজিক রূপান্তর এবং সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য বিকাশেই দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে সোনার বাংলা গড়ে তোলাই আজকের দিনে সবচেয়ে বড় করণীয়।

সাংবিধানিক সংস্কার ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

ক. সাধারণ আলোচনাঃ

১.১ উইকিপিডিয়ার ভাষ্যঃ A constitution is the fundamental set of principles on established laws that govern a nation, organization or other entity. It outlines how power is distributed, defines the rights of citizens and acts as the supreme law that ordinary laws must follow.

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের শাসনকার্য পরিচালনায় সংবিধানই সর্বোচ্চ আইন ও বিধি বিধান। ইহাই জনগণের অধিকারকে সংজ্ঞায়িত করে এবং ক্ষমতার বন্টন এমনভাবে নির্দেশ করে তাকে সমুন্নত রাখতে দেশের সকল আইন কানুন সংবিধানের নীতিমালা মানতে বাধ্য থাকে।

১.২ সংবিধান কোন অলঙ্ঘনীয় বা অপরিবর্তনীয় দলিল নয়।

সংবিধান কোন অপরিবর্তনীয় আইন বা বিধি বিধান নয়। তবে সে সকল পরিবর্তন সংসদ সদস্যগণের দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় আনতে হবে। রেফারেন্ডাম বা গণভোটের মাধ্যমেও সংবিধানে সংশোধন আনা হয়ে থাকে। কারণ গণতন্ত্রে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণই জনগোষ্ঠির প্রতিনিধিত্ব করে। ১৯৭২ সনে সত্তুরের ছয় দফার ভিত্তিতে সংবিধান রচনা ও দেশ পরিচালনার ঘোষণা অনুযায়ী লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার (এলএফও) এর অধীনে নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে অস্বীকার করে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী। ফলশ্রুতিতে স্বাধীনতার বিপক্ষে ভোট দেওয়া শতকরা ২৭জন বাদে সকল বাঙালী একতাবদ্ধ হয়ে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে মরণপণ লড়াই করে দেশ স্বাধীন করে। স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে যে অহেতুক বাক বিতন্ডা দেশের রাজনীতিকে এক চরম অস্বস্তিতে রাখছে তার সমাধান কিন্তু শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ২৭ মার্চ ১৯৭১ তারিখে বিকেল সাড়ে তিনটার কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ঘোষণার মধ্যেই নিহিত। তিনি বলেছিলেন, "I Major Ziaur Rahman declare the independence of Bangladesh on behalf of our great leader Shiekh Mujibur Rahman."

১.৩ বায়াত্তরের সংবিধানের ভিত্তি ও স্বাধীনতা ঘোষণা বিতর্ক

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যবৃন্দ এবং প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ ছয় দফায় নিহিত স্বাধীনতার ম্যান্ডেট এর ভিত্তিতে একটি গণপরিষদ গঠিত হয়। দেশ বিদেশে খ্যাত আইন বিশারদ ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে পয়ত্রিশজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ পোড় খাওয়া রাজনীতিক ও আইন পারদর্শীগণ বঙ্গবন্ধুর সক্রিয় দিক নির্দেশনায় একটি সংবিধান রচনা করেন। ১৮ই কার্তিক ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ তথা ৪ঠা নভেম্বর ১৯৭২ তারিখে গণপরিষদে পাসকৃত বাংলাদেশের সংবিধানটি দেশে বিদেশে সাধুবাদ পেলেও আজ অবধি তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। অনেকবারই এর কাটছাট ও সংশোধন করা হয়েছে। অবশ্য গণভোটের মাধ্যমেও সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে।

১.8 THE PROCLAMATION OF INDEPENDENCE

মজার ব্যাপার হল এই যে বায়াত্তরের সংবিধান নিয়ে অনেক বিতর্ক থাকলেও ১৯৭১ সনের ১০ এপ্রিল জারি করা THE PROCLAMATION OF INDEPENDENCE নিয়ে কেউ তেমন কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেননি। বরং ঐ প্রক্লেমেশনের উপক্রমণিকাতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয় "We, the elected representatives of Bangladesh, as honour-bound by the mandate given to us by the people of Bangladesh

whose will is supreme, duly constituted ourselves into a Constituent Assembly, and having had mutual consultation, and in order to ensure for the people of Bangladesh equality, human dignity and social justice" ইহাতে বর্ণিত তিনটি মুলনীতি তথা সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায্যতা বিতর্কে লিপ্ত সকল মহলের কাছেই অবাধে গ্রহণযোগ্য বলে দৃশ্যমান। বাংলাদেশের সংবিধানেও তিনটি মুলনীতি বিভিন্ন প্রসঙ্গে দীপ্তমান রয়েছে।

খ. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ঃ কয়েকটি সংশোধনীয় প্রয়োজনীয়তা

২.১ দেশের অভাব অভিযোগ, অনাচার এমনকি সকল আমলেই স্বৈরশাসনের অপবাদের জন্য সংবিধানকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর একটি প্রবণতা বিদ্যমান। সরকার প্রধানগণ সংবিধানকে তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও চিরায়ত করার জন্য যে প্রচেষ্টা করে থাকেন তা বন্ধ করে ভারসাম্য আনয়নের সদিচ্ছা কোন আমলেই হালে পানি পায়নি। সংবিধানে কিছু সংশোধন, রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য এবং রাজনৈতিক দলের গণতন্ত্রায়ন সম্পর্কে কিছু বলাই আজকের বক্তব্যের একটি মূল কথা। অন্যটি হলো প্রশাসনিক সংস্কারে জনকল্যাণ বৃদ্ধি করার সুপারিশ।

২.২ নির্বাচন পদ্ধতি ও সরকার প্রধানের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা

সত্তুরের নির্বাচন আর ১৯৯১ সনে অনুষ্ঠিত বিচারপতি জনাব সাহাবুদ্দিনের কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত দুটো ছাড়া অন্য কোন নির্বাচনই সকল মহলে গ্রহনযোগ্যতা পায়নি। কেয়ারটেকার ব্যবস্থাকেও যে দুমড়ে মুচড়ে অকার্যকর করা যায় তার একটি মোক্ষম প্রমাণ ২০০৬ সনের প্রস্তাবিত নির্বাচন বাতিল হওয়া এবং দু'বছর মেয়াদী এক এগারোর সরকার প্রতিষ্ঠা। বিরাজনীতিকরণের প্রচেষ্টা তখন জোরে শোরেই করা হয়। সে সময় RATS PLUS TWO (রাজ্জাক, আমু, তোফায়েল, সুরঞ্জিৎ প্লাস শেখ সেলিম ও জলিল) মাধ্যমে সংস্কারের নামে আওয়ামী লীগে শেখ হাসিনার ক্ষমতাকে খর্ব করার একটি জোরালো প্রচেষ্টা হয়। তাকে দেশে আসতে প্রবল বাধা সৃষ্টি করা হয়। জেদ করে দেশে আসার পর শেখ হাসিনাকে জেলে বন্দী করে রাখা হয়। তবে তাকে মাইনাস করার অপচেষ্টা জনাব জিল্লুর রহমান ও সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম ব্যর্থ করে দেন। অপরদিকে মান্নান ভূইঞার নেতৃত্বের সংশোধনবাদী মহলটি (এখনও কয়েকজন বিরাজমান) বিরাজনীতিকরণের অংশ হিসেবেই বেগম খালেদা জিয়াকে দেশত্যাগে প্রচন্ড চাপ দিতে থাকেন। আপোষহীন নেত্রী জীবন মরণে বাংলাদেশ সংকল্পে অটুট থাকেন। বিরাজনীতিকরণের অপচেষ্টা হিসেবেই রাজনীতি ছেড়ে দেওয়া এবং দেশত্যাগের মুছলেকা নিতে জনাব তারেক রহমানের উপর অকথ্য নির্যাতন করা হয়। সমন্বিত সমান্তরালভাবে এবং সরকারের আশীর্বাদে উপরে বর্ণিত দুটো প্রচেষ্টাকে 'মাইনাস টু' ফর্মুলা নামে কুখ্যাতি দেওয়া হয়। তবে উভয় নেত্রীই দৃঢ়ভাবে সংকট কাটিয়ে রাজনীতির পথ খোলা রাখেন।

২.৩ সংসদ নির্বাচনে সংস্কার প্রস্তাব

প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতিতে উইনার টেইক অল তথা বিজয়ী দলকেই বিশেষ করে নির্বাহী প্রশাসনে এবং তৎমাধ্যমে জুডিশিয়ারিতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা বলয় সৃষ্টি করে কর্তৃত্ব খাটাতে পারেন। সংসদীয় এলাকাভিত্তিক জয় পরাজয় নির্ধারিত হয় বলে মোট ভোট প্রাপ্তির অনুপাতে সংসদে সীটের সংখ্যায় ব্যাপক অসামঞ্জস্য দেখা দেয়। ১৯৯১ সনের নির্বাচনে বিএনপি ১,০৫,০৭,৫৪৯ (এক কোটি পাঁচ লক্ষ সাত হাজার পাঁচশত উনপঞ্চাশ) ভোট পেয়ে ১৪০ টি সংসদীয় আসন লাভ করে। অপরদিকে আওয়ামী লীগ ১,০২,৫৯,৮৬৬ (এক কোটি দুই লক্ষ উনষাট হাজার আটশত ছেষট্টি) ভোট পেয়ে ৮৮টি আসন লাভ করে। আওয়ামী লীগ শতকরা ১২% ভোট কম পেয়ে শতকরা ২১ ভাগ আসন কম পায়। ২০০১ সনে অনুষ্ঠিত পয়লা অক্টোবরের নির্বাচনী ফলাফলে এককেটি সংসদীয় এলাকার সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নির্বাচিত সংসদে মারাত্মক অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। এতে বিএনপি মোট দুই কোটি আটাশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার নয়শত আটাত্তর ভোট পেয়ে ১৯৩টি আসন লাভ করে। আর প্রতিদ্বন্দ্বী

আওয়ামী লীগ মোট দুই কোটি তেইশ লক্ষ পয়ষট্টি হাজার পাঁচশত ষোলো ভোট পেয়ে ৬২টি আসন লাভ করে। দুই লক্ষ আটচল্লিশ হাজার ছয়শত তিরাশি ভোট অর্থাৎ শতকরা ০.৮০ ভাগ ভোট কম পেয়ে আওয়ামী লীগ শতকরা প্রায় ২৬ ভাগ তথা ১৩১টি আসন কম পায়। আবার ২০০৮ সনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ শতকরা ৪৮% ভোট পেয়ে শতকরা ৭৭ ভাগ আসন দখল করে; অথচ বিএনপি শতকরা ৩৩ ভাগ ভোট পেয়ে শতকরা মাত্র ১৬ ভাগ আসন জিতে। তাছাড়া মন্ত্রণালয়ভিত্তিক সংসদীয় কমিটিসহ প্রজাতন্ত্রের চাকরী বাকরী, কেনাকাটা এবং উন্নয়ন অর্থ বরাদ্দে ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে পারেন সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল।

২.৪ উচ্চকক্ষ সৃষ্টির বিধান

এই অসংগতি শোধরানোর জন্য অনেক জ্ঞানীজন আনুপাতিক ভোটের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কিন্তু নেপাল, ইটালী এবং অন্য আরও অনেক দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে আনুপাতিক ভোটের হারের ব্যবস্থা রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা তথা অস্থিরতার একটি বড় উপাদান। তা ছাড়া এ পদ্ধতিতে দলীয় ক্ষমতা অর্থাৎ দল ও সরকারপ্রধানের হাতে আরও নিরঙ্কুশ হবার সম্ভাবনা বেশী থাকে। এ কারণে প্রায় সকল গণতান্ত্রিক দেশের মতো বাংলাদেশেও দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট একটি সংসদ থাকার পক্ষে জোরালো ও যুক্তিসংগত পরামর্শ দিয়েছেন সংবিধান ও সংসদ বিশেষজ্ঞগণ। ৩০০ সংসদ সদস্য নিম্নকক্ষ সংসদীয় এলাকা ভিত্তিক সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন। আর ১০০ বা সকল মহলের সর্বসম্মত অন্য কোন সংখ্যা সদস্য বিশিষ্ট উচ্চকক্ষ নিম্নকক্ষে দলভিত্তিক প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে উচ্চকক্ষ সংসদ সদস্য নির্বাচিত হতে পারেন। উচ্চ কক্ষের ব্যবস্থা একদিকে যেমন ভোটে অনীহা অথচ বিজ্ঞজনকে সংসদীয় গণতন্ত্রে সম্পৃক্ত করা যাবে অন্য দিকে তেমনি উপযুক্ত ক্ষমতায়নের মাধ্যমে উচ্চকক্ষে অর্থপূর্ণ রক্ষাকবচ হিসেবেও কাজ করতে পারবে। নিম্নকক্ষের ব্রুট মেজরিটিকে প্রশমন বা মোলায়েম করার এটি একটি কার্যকর উপায় হতে পারে।

২.৫ সংবিধানের ৭০ ধারার স্বেচ্ছাচারিতা

স্থিতিশীলতার নামে পার্টি হুইপের গিলোটিন সংসদে কল্যাণমূখী ভিন্নমত প্রবাহের পথ রুদ্ধ করে রাখে। আবার ইচ্ছেমত দল বদল করে সংসদকে অকার্যকার করে দেবার ব্যবস্থাও কোন উত্তম পন্থা নয়। মাঝামাঝি অবস্থানে তিনটি বিষয় ছাড়া যথা সংবিধান সংশোধন, অনাস্থা প্রস্তাব এবং অর্থবিল ছাড়া সকল বিষয়ে পার্টি হুইপের বিপরীতে ভোট দেয়ার বিধান রাখা যেতে পারে। অবশ্যই এ তিনটি বিষয়েও দলের অবস্থানের বিপরীতে বক্তব্য দেয়ার সুযোগ রাখা যেতেই পারে। বিধি নিষেধ কেবল ভোট দানের ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে। তবে এক প্রতীকে নির্বাচিত একজন সংসদ সদস্য পদত্যাগ করলে সংসদে তার সদস্যপদ বাতিল হয়ে যেতে হবে।

২.৬ ফ্লোর ক্রসিং

যদি একটি রাজনৈতিক দলের প্রতীকে নিবন্ধিত সংসদ সদস্যগণের দুই তৃতীয়াংশ সদস্য ঐ দলের সংসদীয় দলের নেতৃত্বে অনাস্থা প্রকাশ করে স্পীকার সমীপে তা প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে ঐ গ্রুপের সদস্যগণ তাদের সংসদীয় আসন অক্ষুণ্ন রেখে আলাদা দল বা গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। তবে তারা যদি মূল দলের নাম ও প্রতীকের দাবীদার হন অথবা অন্য কোন দলের সাথে সংযুক্ত হতে চান, তাহলে মূল দলীয় নেতৃত্বের সম্মতি ছাড়া তা করতে দেওয়া সমীচিন হবে না।

২.৭ একজন সংসদ সদস্য অনুরাগ বিরাগের উর্ধ্বে উঠে প্রজাতন্ত্রের কল্যাণের জন্য প্রস্তাবিত অথবা নিজ উদ্যোগে প্রধানত আইন প্রণয়নের কাজে সম্পৃক্ত থাকেন। তিনি নিজের বা পরিবারের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ক আইন প্রণয়নে সর্বাত্মক সতর্কতা অবলম্বন করবেন যাতে কোন পক্ষপাতিত্বেও অভিযোগ উঠার সুযোগ না থাকে।

২.৮ একজন সংসদ সদস্য স্থানীয় পর্যায়ের প্রশাসনিক অথবা উন্নয়ন কর্মকান্ডে জড়িত হয়ে পড়বেন না।

২.৯ ডেপুটি স্পীকার ও পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ার

অতি অবশ্যই ওয়েস্টমিনিস্টার সংসদীয় গণতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী ডেপুটি স্পীকার (দুটো পদ থাকলে এক নম্বর পদ) ও পাবলিক অ্যাকউন্টস কমিটির চেয়ারম্যানের পদ বিরোধী দলের জন্য সংরক্ষণ করে ছেড়ে দিতে হবে। সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারপার্সন ও সদস্যপদে বিরোধী দলকে তাদের সদস্যপদের সংখ্যায় প্রাপ্যতার বেশী সুযোগ দিলে গণতন্ত্রের মহিমা বৃদ্ধি পাবে।

২.১০ সংবিধানের ১৪৭ ধারার ৪ উপধারায় একটি অতিরিক্ত (ব) বিধান সংযুক্ত করে সংসদ সদস্যদের নাম সন্নিবেশিত করা যেতে পারে। অর্থাৎ সংসদ সদস্যগণকে লাভজনক পদে নিয়োগ লাভের অযোগ্য করা যেতে পারে।

২.১১ সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা, উপনেতা ও হুইপগণকে যথাযোগ্য মর্যদা দেওয়ার ঐতিহ্য গড়তে হবে। তবে বিরোধী দলকেও দায়িত্ববান হতে হবে।

গ. রাষ্ট্রপতি

৩.১ নির্বাচন ও ক্ষমতার পরিধি

বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের একচ্ছত্র ক্ষমতা কুক্ষিগত করার অন্যতম প্রধান কারণ রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে ন্যস্ত দায়িত্ব ও ক্ষমতার অপ্রতুলতা এবং সেই সীমিত ক্ষমতা ব্যবহারেও রাষ্ট্রপতির অনীহা। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যারা ভোট দেন সে সংখ্যা মাত্র ৩০০ জন সংসদ সদস্য। ট্রেজারী বেঞ্চের নেতা তথা প্রধানমন্ত্রীর মনোনীত ব্যক্তিই রাষ্ট্রপতি হয়ে থাকেন (ধারা ৪৮)। আবার সংবিধানের ৫২ নং ধারায় সরকারী দল তথা সরকার প্রধানের ইচ্ছা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে ইমপিচ করার নোটিশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণই জারী করতে পারেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির নির্বাচন, কার্যকাল ও দায়িত্ব পালনের পরিধি বলয় সরকারপ্রধানের সিদ্ধান্তের উপরই নির্ভরশীল।

এহেন অবস্থার উন্নতি করে সরকার প্রধান ও রাষ্ট্র প্রধানের ক্ষমতার কিছুটা হলেও ভারসাম্য আনার স্বার্থে (১) রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সরাসরি ভোটের মাধ্যমে অথবা (২) একটি সম্প্রসারিত ইলেক্টোরেল কলেজের মাধ্যমে অর্থাৎ সংসদ সদস্যগণ ছাড়াও উচ্চকক্ষের সদস্যগণ, সকল কর্পোরেশনের নির্বাচিত মেয়র ও কমিশনারগণ, জেলা কাউন্সিলরের নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ এবং উপজেলার নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সমাহারে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। এর ফলে রাষ্ট্রপতিকে সরকার প্রধানের আজ্ঞাবহ থাকা থেকে মুক্ত করা হবে।

৩.২ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব বৃদ্ধি

সংবিধানের ৪৮ ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতিকে সংসদ ভেঙে দেওয়া এবং মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করার ক্ষমতা প্রদানের বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা এবং গণভোটের আয়োজন করা যেতে পারে। তবে এটি আকাশকুসুম কল্পনা এবং বাস্তবে একনায়কতন্ত্রের জন্ম দিতে পারে। এ সম্পর্কে হাজার বার চিন্তা ভাবনা ও পরামর্শ করে তবেই অগ্রসর হতে হবে।

সকল সাংবিধানিক পদে নিয়োগের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যাস্ত করা যেতে পারে। তরে তিনি সেই নিয়োগ দেওয়ার পূর্বে প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেতার মতামত সম্পর্কে পরামর্শ নিতে পারেন যদিও সিদ্ধান্ত তার কাছেই ন্যস্ত থাকা সমীচিন হবে।

৩.৩ নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার

সব দলের সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের নির্বাচনে ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটেছে। তবে ২০১৪ সনের নির্বাচন সম্পর্কে কিছু বাড়তি বিষয় লক্ষ্য করা গেছে। দেশে গোলযোগ অরাজকতা। দোকানে, বাসে আগুন, মানুষ মরছে। আসন্ন নির্বাচন নিয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও প্রধান বিরোধী দল বিএনপি (+ জামায়াত) এর মধ্যে জলিল-মান্নান ভূইঞার আলোচনা কয়েক দফা নিষ্ফল। জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ ও ওআইসি মধ্যস্থতা করছে। কূটনৈতিক মহল তৎপর। এর মধ্যে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনকালীন সরকারের একটি মৌলিক প্রস্তাব দিলেন ঃ দশজনের সরকার, পাঁচজন আওয়ামী লীগের এবং পাঁচজন বিএনপির। অর্থ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিএনপির হাতে থাকবে। কিন্তু হয়েও হলো না। বিরোধী জোট প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বসে। নির্বাচন হল বটে। ১৫৩টি সংসদীয় আসনে যে আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য কোন প্রার্থী মনোনয়ন ফরম জমা দেননি দলের নির্বাচনী কমিটি সে খবরও রাখেননি।

আমি কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য না হলেও রাজনীতি সচেতন একজন বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিক। বিভিন্ন সূত্রের তথ্য এবং আমার মূল্যায়নে আমি নিশ্চিত ছিলাম- ২০১৪ সনের নির্বাচনে বিএনপি জোট জয়লাভ করবে অথবা নিদেনপক্ষে খুব শক্তিমান বিরোধী দল হয়ে সংসদে প্রবেশ করবে। দলীয় সরকারের অধীনে একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল। এই প্রেক্ষিতে আমার বলতে কোন দ্বিধা নেই যে একটি শক্তিমান ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের অধীনে উপযুক্ত রক্ষাকবচে পৃথিবীর অন্যান্য গণতন্ত্রের মতই দলীয় সরকারের অধীনেই সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া উচিৎ এবং তা নিরপেক্ষ ও ন্যায়নিষ্টভাবেই সম্পন্ন করা সম্ভব। কেয়ারটেকার সরকার রাজনীতির উপর অনাস্থাজনিত আমলাতান্ত্রিক একটি অগ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা। নির্বাচনের ৯০ দিন আগে দলীয় সরকারের পরিধি হ্রাস করে রুটিন ওয়ার্কের নির্বাচনী সরকারে রূপান্তর ঘটতে পারে। সংসদ সদস্যগণের ক্ষমতা ও প্রটোকল সে সময় স্থগিত থাকতে পারে। এনইসি সে সময় কার্যকর থাকবে না আর যথারীতি প্রশাসনিক ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের হাতে চলে যাবে।

৩.৪ সংবিধানের ৭৭নং ধারা অনুসরণ করে প্রথমবারের মত উপযুক্ত কর্তৃত্ব সম্পন্ন ন্যায়পাল নিয়োগ দিলে গণতান্ত্রিক চেক ব্যালেন্স রক্ষা করার পক্ষে শক্তিযোগ হবে।

৩.৫ নির্বাচন ব্যবস্থার আরও কিছু সংস্কার

আরপিও তে একটি রাজনৈতিক সদস্যভূক্তি তিন বছর না গেলে দলীয় মনোনয়ন পাওয়া যাবে না বলে যে বিধান আছে তা পাঁচ বছর পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। দলীয় মনোনয়ন স্থানীয় ইউনিটের (উপজেলা এবং / অথবা জেলা) সুপারিশ অনুযায়ী দেওয়ার বিধান করা যেতে পারে। নির্বাচনী খরচে লাগাম টানা খুবই জরুরী। প্রত্যেক প্রার্থীর জন্য নির্বাচন কমিশনের বেঁধে দেওয়া খরচ সীমার একটি ক্ষুদ্র অংশ হলেও সরকারী কোষাগার থেকে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকলে নির্বাচনী খরচের বিষয়টি অডিটের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের অধীনে চলে আসবে। তবে নির্বাচনে প্রার্থী হতে যে জামানতের টাকা দিতে হয় তা খুবই কম হওয়ার সুপারিশ রইল। সংসদীয় প্রার্থী চয়নে মনোনয়ন বোর্ডের সদস্যগণকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের অযোগ্য করে দিতে হবে। রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের শর্ত হিসেবে একটি রাজনৈতিক দলের কার্যনির্বাহীগণের অন্ততঃ একতৃতীয়াংশ নারী হতে হবে এবং তিন চারটি নির্বাচনের পর এ অনুপাত ফিফটি-ফিফটি করা যেতে পারে। নারীর ক্ষমতায়ন ও তাদের স্বাভাবিক মর্যাদা সৃষ্টি ও সংরক্ষণে কোটা (সাধারণতঃ দুর্বলদের জন্য প্রচলিত) সিস্টেম বিলোপের সুপারিশ করি। তাছাড়া বিশেষজ্ঞ অর্থনীতিবিদ ও সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক মহারথীদের হিসাব কিতাব তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ মাধ্যমে গৃহস্থালী কাজকে সমষ্টিক অর্থনীতির একটি অনুপাত হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া সমীচিন হবে।

৩.৬ ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতা

স্পর্শকাতর ভূ রাজনৈতিক বাস্তবতায় বাংলাদেশে প্রাদেশিক ইউনিট সৃষ্টি আপাততঃ সম্ভব নাও হতে পারে। উল্লেখ্য যে ১৯৪৭ সনের আগষ্টে বৃটিশ বিতাড়ন কালে ভারত ও পাকিস্তান ছাড়াও গ্রেটার বেঙ্গল নামে তৃতীয় একটি স্বাধীন দেশের সম্ভবনা (ক্যাবিনেট মিশনের সুপারিশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ) সোহরাওয়ার্দী-কিরণশংকর-শরৎ বসু ফর্মুলা মহাত্মা গান্ধী ও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর আলাদা আলাদা সমর্থন প্রত্যাহারের ফলে ভেস্তে যায়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে পাঞ্জাব ও বেঙ্গলের সীমানা নির্ধারণী Radcliffe Commission প্যামেলা মাউন্টবেটেনের মাধ্যমে পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর চাপ, পূর্ব বাংলার মুসলমানদের স্বার্থ দেখার জন্য কমিশন সদস্য বিচারপতি আবু সালেহ মোহাম্মদ আকরামের এ বিষয়ে ন্যূনতমদ জ্ঞান ও আগ্রহের অভাব এবং প্রবল প্রতাপান্বিত কংগ্রেস নেতা শ্যামা প্রসার মুখার্জির আন্দোলন তথা অনশনের হুমকির ফলশ্রুতিতে কুচবিহার, মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও করিমগঞ্জ বিপুল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা হওয়া স্বত্ত্বেও পূর্ব বাংলার সাথে সংযুক্ত হয়নি। তদানীন্তন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর প্রিমিয়ার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যখন কলিকাতা এবং উপরে উল্লেখ করা অঞ্চলগুলো নিয়ে পূর্ব বাংলায় যোগ দিতে চাইলেন তখন মুসলীম লীগ হাই কম্যান্ড তাকে বাদ দিয়ে বঙ্গীয় পরিষদে বিরোধী দলীয় নেতা তবে তাদের অনুগত খাজা নাজিমউদ্দিনকে পূর্ব বাংলার মূখ্যমন্ত্রী হিসেবে চয়ন করেন।

৩.৭ সরকার ও রাজনৈতিক দলের মধ্যে পৃথকীকরণ

পৃথিবীর দুটো বৃহত্তম গণতন্ত্র তথা ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রে দলীয় প্রধান ও সরকার প্রধানকে 'ওয়ানম্যান ওয়ান পজিশন' নীতিতে আলাদা করা আছে। ভারতে ১৯৬০ এর দশকে পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর পরামর্শ অনুসারে কংগ্রেস দলের নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী করুণাস্বামী কামরাজ নাদার (মাদ্রাজ), সেচমন্ত্রী মহারাষ্ট্রের এস. কে. পাতিল ও পশ্চিম বাংলার প্রতাপশালী নেতা অত্যুল্য ঘোষসহ ছয়জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রীকে সরকার থেকে পদত্যাগ করিয়ে কামরাজ প্ল্যানের অধীনে দলীয় কর্মকান্ডে ন্যস্ত করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে শুরু থেকে প্রেসিডেন্সী ও দলীয় প্রধান ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। তবে যুক্তরাজ্যে দলীয় প্রধানই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হয়ে থাকেন।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা ও জাতীয় পর্যায়ে বিতর্ক পরামর্শ এমনকি গণভোট আয়োজন করা যেতে পারে। তবে টার্ম লিমিটেশন বিভিন্ন দেশে চালু থাকলেও তা গণতান্ত্রিক স্পিরিটের পরিপন্থী।

ঘ. একটি শক্তিমান, গতিময়, নিরপেক্ষ, ন্যায্য এবং আধুনিক প্রশাসন ব্যবস্থা চালুকরণঃ

৪.১ একটি দক্ষ, মেধাবী ও আধুনিকমনস্ক প্রশাসন ব্যবস্থা

স্বাধীনতার মর্মবাণী তথা সমতা, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়নিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠা এবং আর্থ সামাজিক-সাংস্কৃতিক অগ্রগতির সূচনা ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখতেই একটি স্থায়ী ও আধুনিক শাসনব্যবস্থা প্রয়োজন। অবশ্যই মেধাভিত্তিক একটি চাকুরী প্রদান নীতি, আধুনিক প্রশিক্ষণ, নিরপেক্ষভাবে পদায়ন, পদোন্নতি ও বদলী এবং ন্যায়নিষ্ঠভাবে শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন করার একটি প্রত্যাশিত ব্যবস্থার পরিবেশ ও নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। সরকারী কর্মকর্তাগণের নিজস্ব ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মতামত যেন তাদের সিদ্ধান্ত ও পরামর্শ প্রদানের প্রক্রিয়াকে আচ্ছন্ন না করে। অনুরূপভাবে ভিন্ন মতাবলম্বী চাকুরেদের নানাভাবে নাজেহাল করা বা পদোন্নতি এবং উত্তম পদায়নে বঞ্চিত করা রুখতে হবে। রাজনীতি চিরন্তন তবে রাজনীতিবিদের পরিবর্তন স্বাভাবিক। তাই স্বাধীনতার মূল্যবোধ, সামাজিক ন্যায়নিষ্ঠতা এবং নৈতিকতার নিরিখে দেশ পরিচালনায় আমলাতন্ত্রের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও ধারাবাহিকতা অপরিহার্য।

৪.২ প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ

ঢাকায় বসে আঠারো কোটি মানুষের জন্য সুষ্ঠু ও ন্যায়সঙ্গত সেবা দক্ষতার সাথে প্রদান করা সম্ভব হবে না। যেহেতু প্রদেশ করা যাচ্ছে না, বিভাগীয় অথবা জেলা প্রশাসনকে ক্ষমতায়িত করে অর্থ ও সম্পদ বরাদ্দসহ কার্যক্রমের যথাসম্ভব স্থানান্তর করার চিন্তা করা যেতে পারে। সত্যিকারভাবে স্বাধীনতার পঞ্চান্ন বছরেও বাংলাদেশের প্রশাসনে যুগোপযোগী কোন আমূল পরিবর্তন আসেনি। একটি উচ্চ ক্ষমতা ও দক্ষতা সম্পন্ন কমিশন (একজনের কমিশন হলেও আপত্তি নেই) এমনকি একজন নিরপেক্ষ সিদ্ধহস্ত বিদেশীকে দিয়ে একটি আধুনিক অর্গানোগ্রাম এবং যুক্তিযুক্ত মানবসম্পদ নিয়োজন ও পারস্পরিকতা সৃষ্টি বিবেচনা করা যেতে পারে। জেলা পর্যায়কে যদি বিকেন্দ্রীকৃত শক্তিবলয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয় তাহলে জেলা প্রশাসককে কি পুরোনো দিনের মতো আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সমন্বয়ের সকল ক্ষমতা দেওয়া হবে! পুলিশ রেগুলেশন অব বেঙ্গল অনুসারে জেলা কমিশনার কি পুলিশ সুপারের বার্ষিক গোপনীয় রিপোর্ট লিখবেন? তবে অর্থবহ বিকেন্দ্রীকরণের স্বার্থে কেন্দ্রীয় বাজেটের অর্ধেক উপজেলাগুলোর মাধ্যমে নিয়োজন করা যায়। ফর্মূলা ঃ অর্ধেক সমানভাবে প্রতি উপজেলায় আর বাকী অর্ধেক জনসংখ্যার অনুপাতে। স্থানীয় পর্যায়ে আহরণ করা রাজস্ব কেন্দ্রে যাবে কি-না তাও বিচার্য।

৪.৩ ঢাকা মেট্রোপলিটন সরকার (ডিএমএ)

রাজধানী এখন দুই কোটি লোকের বসবাসে ভারাক্রান্ত। সেবার পরিধি সেভাবে বাড়ানো সম্ভব হয়নি। তবুও মানুষ ঢাকায় আসছে গ্রামগঞ্জ থেকে। দেশে বার্ষিক জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি যেখানে শতকরা ১.৩ ভাগ, রাজধানীর জনসংখ্যা সেখানে শতকরা ৪ ভাগ হারে বাড়ছে। রাজধানীর নানান সুযোগ সুবিধা বিশেষ করে অনানুষ্ঠানিক খাতে চাকরীর সুবিধা একটি চুম্বক আকর্ষণ (পুল ফ্যাক্টর) সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে আইন শৃঙ্খলার অবনতি, স্বাস্থ্য সেবার ঘাটতি, শিক্ষা সেবার পিছিয়ে পড়া মান, কৃষি ও তদসম্পর্কিত কর্মকান্ডে বর্তমান প্রজন্মের বিপুল অনীহা এবং গ্রামবাংলায় জমির উচ্চমূল্য নতুন করে বহু মানুষকে মহানগরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে (পুশ ফ্যাক্টর)। এমতাবস্থায় দীর্ঘদিন থেকে আলোকিত সাভার, গাজীপুর, কেরানীগঞ্জ ও নরসিংদীর শহরতলীর চতুষ্টয়কে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারে গড়ে তোলার সুপারিশ করছি। ঢাকাকে দিল্লী এবং অন্যান্য নগর ইউনিট তথা একটি প্রদেশতুল্য ঢাকা মেট্রোপলিটন অথরিটি (ডিএমএ) হিসেবে গড়ে তোলার যে প্রস্তাব আওয়ামী লীগ ও বিএনপির পর পর দুজন মেয়র উত্থাপন করেছিলেন সে সম্পর্কেও অগ্রাধিকারমূলক সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। সমন্বয়বিহীন সেবাখাত সমূহে প্রচুর দিরুক্তি ও অপচয় ঘটে। সমন্বয়ের শক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে ডিএমএ এর হাতে দিলে সকল অপচয় কমিয়ে আনবে। ডিএমএ প্রশাসনে ওয়ান পয়েন্ট সিদ্ধান্ত সেবা কেন্দ্রের হাতে যদি বিদ্যুৎ ও গ্যাসের একটা অংশ বরাদ্দ দেবার ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয় তাহলে শিল্প ইউনিট স্থাপনে বৃহত্তর গতি আনা যাবে স্থানীয় ও বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ বাড়বে। শহরতলীগুলো থেকে দ্রুতগামী কমিউটার রেল যোগযোগ করা গেলে বহু কর্মজীবী দৈনিক যাতায়াতে ঢাকায় যাতায়াত করতে পারবেন। ইন মাইগ্রেশন অবশ্যই কমবে। এক বছরের নোটিশ দিয়ে গৃহস্থালীতে পাইপলাইনে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হবে। অন্য সকল দেশের মত গ্যাস সাপ্লাই সিলিন্ডারে হবে।

৪.৪ নগরসেবার পুনর্বিন্যাস মাধ্যমে ট্রাফিক সেবার ভীড়াভীড়ি হ্রাস

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে এলাকাভিত্তিক স্কুল ভর্তি দেশের বিভিন্ন স্থানে যানবাহনের ভীড় হ্রাস করে। আমাদের দেশে যদি সেভাবে ভর্তি করা হয় এবং স্কুলে ব্যক্তিগত যানবাহনে আসার নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়, তাহলে যান চলাচলে স্বস্তি আনা ছাড়াও ছেলে মেয়েদের সামাজিক সংযোগ বৃদ্ধি পেয়ে সম্প্রীতি সৃষ্টি করবে। এর সাথে যদি বাধ্যতামূলক স্কুল ইউনিফর্ম চালু করা হয় তাহলে আয় সম্পদের বৈষম্যজনিত ভেদাভেদ কিছুটা হলেও হ্রাস পাবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এলাকাভিত্তিক ভর্তির বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলোতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার অগ্রগতি সাধন করে আসছে।

জেব্রা ক্রসিং সৃষ্টি করে পথচারীগণের যত্রতত্র রাস্তা পারাপার বন্ধ করা যেতে পারে। প্রথম প্রথম একটি তালাবদ্ধ বাক্সে নিয়ম ভঙ্গকারীগণের উপর বিশ টাকার জরিমানা জমা করা যেতে পারে। প্রতিবন্ধি জনগণের জন্য রেলে, বাসে, জাহাজে এবং রাস্তা পারাপাওে রিজার্ভ ব্যবস্থা প্রতিপালনে কড়াকড়ি করা যেতে পারে। দেশের প্রতিটি ভবনে ভূমিকম্প প্রতিরোধক ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা জরুরী।

৪.৫ আরও বিকেন্দ্রীকরণ

সরকারী অফিস আদালত, ব্যাংক বীমা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফ্লেক্সি লোডের সতর্ক সমন্বিত প্রয়োগ ট্রাফিক জ্রাম হ্রাসে সহায়ক হবে। কমাতে পারে পলিউশনও। অনেকগুলি সরকারী প্রতিষ্ঠান কিন্তু ঢাকার বাইরে স্থানান্তর করা সম্ভব। বাংলাদেশ রেলওয়ে দস্তুরমতো ঈশ্বরদী বা সিরাগঞ্জে হেডঅফিস স্থানান্তর করতে পারে। বাংলাদেশ নেভি ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় চট্টগ্রামে সরিয়ে নিতে বাঁধা দেখি না। টি-বোর্ড শ্রীমঙ্গলে যেতে পারে। স্থানীয় সরকার কুমিল্লায়, কৃষি মন্ত্রণালয় রাজশাহীতে, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ময়মনসিংহে, শিল্প মন্ত্রণালয় যশোহরে এবং যোগাযোগ মন্ত্রণালয় খুলনায় স্থানান্তরের কথা ভাবাই যায়। বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী ব্যাংকের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ভিন্ন ভিন্ন জেলা সদরে যেতে পারে। ইন্টারনেটের বিপুল অগ্রগতির প্রেক্ষিতে ঢাকা থেকে এ সকল সরকারী মন্ত্রণালয় ও অফিস স্থানান্তরে তেমন কোন অসুবিধা সৃষ্টি করবে না। খেয়াল রাখতে হবে যেন এখনকার মতো বড় বড় শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ যুগের পর যুগ ঢাকায় চাকরী করতে না পারেন।

কয়েকটি দেশে মেধাবী ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণকে প্রাইভেট প্র্যাকটিস থেকে বিরত থাকতে এবং গবেষণা কাজে নিয়োজিত থাকতে মুল বেতন তিন চার গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তবে প্রতিবেশী দেশসমূহের তুলনায় বাংলাদেশে রোগীগণ কেবল স্বল্প সংখ্যাক ডাক্তার বিশেষজ্ঞের কাছে কেন ভীড় জমান এবং তারা কেন যত্ন দিতে পারা রোগীর চেয়ে অনেক বেশী রোগী দেখেন সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা জরুরী। বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে যে বাংলাদেশের চিকিৎসা খুব উন্নত হলেও নার্সিং এবং সার্জারি পরবর্তী সেবার মান ভাল নয়।

কারওয়ান বাজার এবং অন্যান্য বড় পাইকারী বাজারে বহুতল ভবনাদি নির্মাণ করে খুচরা দোকানীগণকে ফুটপাথ থেকে স্থানান্তর করা যেতে পারে।

৪.৬ কর্ম সপ্তাহ

উলামায়ে কেরামগণ সম্মতি দিলে সপ্তাহে সাড়ে চার দিন যথা সোমবার- বৃহস্পতিবার ৮.৩০ থেকে ৪.৩০ (মাঝখানে আধাঘন্টার যোহরের নামাজ ও মধ্যাহ্নভোজের বিরতি) ৩০-০২=২৮ ঘন্টা + শুক্রবার ৮-১২ অর্থাৎ 4 ঘন্টা মিলিয়ে ৩২ ঘন্টার কর্মঘন্টা চালু করা হলে নিম্ন বেতনভূক অনেকেই অন্য কোন কাজ করতে পারবেন। বিকল্প হিসেবে (সোম-বৃহঃ) কর্ম সপ্তাহ চারদিনের (৮-৪.৩০ আধাঘন্টার বিরতি) ৪= ৩২ ঘন্টার কর্মসপ্তাহ করা যেতে পারে। এতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খরচ কমবে। পল্যুশন ও কমতে পারে। উভয় বিকল্পেই রবিবার বন্ধ থাকাতে বিশেষ করে পশ্চিমা দুনিয়ার সাথে লেনদেন সহজতর হবে।

৪.৭ জনবল জরিপ ও সুষ্ঠু পদায়নে দক্ষতা বৃদ্ধি

বিগত কয়েক বছর যাবৎ বিশেষ করে প্রশাসনে উচ্চতর পর্যায়ে পদসংখ্যার চেয়ে পদায়িতজনের সংখ্যা তিন চার গুণ হয়ে আছে। এমনও দেখা গেছে যে এজন অতিরিক্ত সচিবের অধীনে তিন জন অতিরিক্ত সচিব কর্মরত। আবার একটি সম্প্রতি দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পদোন্নতি দেওয়া একজন সচিবের তুলনায় কয়েক বছরের প্রবীন, সুনামধারী ও দক্ষ অতিরিক্ত সচিব কর্মরত রয়েছেন। বিগত কয়েক বছরে এ অব্যবস্থা নিয়ে মন কষাকষি, কথিত উৎকোচের সংবাদ ও সেবার মানে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এক বছর আনুষ্ঠানিক পদোন্নতি বন্ধ রেখে উচ্চ পদের সংখ্যা অতিরিক্তগণকে তাৎক্ষণিকভাবে পদোন্নতি দিয়ে অবসরে

পাঠানোর কথা ভাবে যেতে পারে। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণকেক অধীনস্ত কর্পোরেশন বা অধিদপ্তরের কাজ করতে দেওয়া সঠিক নয়। প্রেষণে বিশেষায়িত কাজের শীর্ষপদে অন্য ক্যাডারের লোক বসানো একদম ঠিক নয়। উচ্চপদস্থগণের অনেকেই নাকি ব্যাংক বীমা কর্পোরেশন ও বহুজাতিক সংস্থায় একাধিক কাজে নিয়োজিত থেকে কর্মশৃঙ্খলা ভঙ্গ করছেন।

৪.৮ নিয়োগ প্রক্রিয়া

বাংলাদেশ কর্ম কমিশন উচ্চপদে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বেশ কিছু ভালো উদ্যোগ নিলেও গাড়ীচালক শতকোটি টাকার মালিক আইয়ুব আলী মারফতে প্রশ্নপত্র ফাঁস হতে থাকে বলে অভিযোগ। আবার লিখিত পরীক্ষায় হা না কুইজ থাকার ফলে মেধার বদলে ভাগ্য পরীক্ষা হয়ে থাকে এবং এতে অসাধু উপায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষার মানের কথিত অবনতি নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হলেও আজকের শীর্ষস্থানীয় মেধাবীগণ বিগত দিনের শীর্ষস্থানীয় মেধাবীগণের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার বলেই মনে হয়। সম্প্রতিকালে সরকারী চাকুরীর বেতনাদি, সুযোগ-সুবিধা, ও অবসরভাতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মেধাবীগণের একটি বড় অংশ সেদিকে আকৃষ্ট হচ্ছেন। তবে বিসিএস (প্রশাসন) এর তুলনায় বিসিএস (পুলিশ), বিসিএস (কাস্টমস) বা বিসিএস (ট্যাক্সেশন) ক্যাডারগুলোর প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণ দুর্নীতির সম্ভাবনা সম্পর্কে ভাবিয়ে তোলে বৈকি। আবার কৃষি, মৎস্যপালন, বন ও পরিবেশ এলাকাগুলো আগামী দিনের দ্রুত এবং সুষম প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে বলে সেদিকেও নিয়োগপ্রত্যাশীগণকে আকৃষ্ট করতে হবে। তাছাড়া মূল্যস্ফীতির প্রেক্ষিতে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীগনের বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি সিপিআই এর সাথে সূচকিত করা যেতে পারে ।

বাংলাদেশের সকল নাগরিকের চাকরী ক্ষেত্রে সমান অধিকারের নিশ্চয়তা দিয়েছে আমাদের সংবিধান (প্যারা ২০)। তাই রাজনৈতিক মতামত বা ধর্ম বর্ণ গোত্রের অংশী বলে মেধায় উত্তীর্ণ কাউকে চাকরী পাওয়া থেকে পুলিশ ভেরিফিকেশনের নামে সাধারণতঃ বাদ দেওয়া যাবে না। তবে স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধাচরণকারীগণকে অবশ্যই প্রচলিত আইনে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে বিচারাধীন করা যাবে।

৪.৯ সিনিয়র সুপিরিয়র পুল

দক্ষতা ও ন্যায় নিষ্ঠতার স্বার্থে যুগ্মসচিব পর্যায়ে একটি সিনিয়র সার্ভিস পুল গঠন করা যেতে পারে। জাতীয় বেতন স্কেলের ৫ম ও ৪র্থ গ্রেডের সকল কর্মকর্তা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের উদ্যোগে একটি পরীক্ষা মাধ্যমে এই পুলে প্রবেশ করার সুযোগ পাবেন।

৪.১০ সরকারী চাকুরেগণের বাসস্থান এবং নগর উন্নয়ন

পুরাতন রেলস্টেশন থেকে সদরঘাট পর্যন্ত এলাকাব্যাপী চল্লিশ হাজার বিশতলা ভবন ফিফটি ফিফটি ভিত্তিতে আবাসন কোম্পানীর মাধ্যমে নির্মাণ করা যেতে পারে। ফলে মানবেতর জীবনধারী বসবাসকারীগণকে ২ লক্ষ এবং সরকারী কর্মকর্তা কর্মাচারীগণকে ২ লক্ষ ফ্ল্যাট বরাদ্দ দেওয়া যায়। এতে আবাসন খাতও চাঙ্গা হয়ে আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে বাড়তি শক্তি যোগ করবে। প্রস্তাবিত নগরাঙ্গনে খেলার মাঠ, উপসনালয়, বিনোদন ও সংস্কৃতি কেন্দ্র থাকবে। সর্বনাশা কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিগুলোকে বহুদূরে কোণে সরিয়ে নেওয়া যাবে।

৬. ব্যাংকিং সংস্কার কেন জরুরী

৫.১ কিছু তথ্য উপাত্ত ফিরে দেখা

২০০১ সনে একটি ব্যাংক ঋণ ৯০ দিনে পরিশোধ না হলে তাকে খেলাপী বলে সংজ্ঞায়িত করা হতো। এখন তাতে ৩৬৫ দিন পুরো এক বছরের সুযোগ দেওয়া হয়। তখন এক পরিবার থেকে দু'জনের বেশী বেসরকারী

ব্যাংকের পরিচালক হতে পারতেন না, এখন পারেন চারজন। বেসরকারী ব্যাংক পরিচালকের মেয়াদ ছিল চার বছর, এখন বারো বছর। খেলাপী ঋণ পুনঃতফশীলে ২০০১ সনে শতকরা দশ ভাগ অগ্রীম পরিশোধ করতে হতো; এখন বড় খেলাপীদের ক্ষেত্রে জমা দিতে হয় মাত্র খেলাপী ঋণের শতকরা ০১ (এক) ভাগ। আগে দ্বিতীয়বার পুনঃতফশীল করতে শতকরা বিশ ভাগ অগ্রীম দিতে হতো। এখন শতকরা এক ভাগেই চলে। দুবারের বেশী পুনঃতফশীল করতে বড় ধরণের যৌক্তিকতা প্রয়োজন হতো এখন যে কতবার বৃহৎ খেলাপীদের ঋণ পুনঃতফশীল হয় তা বোঝা মুশকিল। তাতে যা হবার তাই হয়েছে ১৯৯৬ সনে ঋণ খেলাপীর পরিমাণ ছিল পাঁচ হাজার কোটি টাকা; পাঁচ বছরে অর্থাৎ ২০০১ সনে তা শতকরা বিশ ভাগ কমিয়ে চার হাজার কোটি টাকাতে নামিয়ে আনা সম্ভব হয় ইস্পাতকঠিন এবং দলমত নির্বিশেষে ন্যায়নিষ্ঠ স্বচ্ছতা নিপেক্ষেতার সাথে। খেলাপী ঋণ ২০০৬ সনে বেড়ে দাঁড়ায় ৯ (নয়) হাজার কোটি টাকা যা ২০০৯ সনে বেড়ে যায় ২২ (বাইশ) হাজার কোটিতে। বর্তমানে খেলাপী ঋণ মোট ঋণের শতকরা ৩৬ ভাগ তথা ৬ (ছয়) লক্ষ কোটি টাকার উপরে। এর ফলে অর্থনৈতিক শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে কতিপয় হাতে। বেড়েছে আয় সম্পদ ও সুযোগ বৈষম্য। অর্থনীতি সে কারণে কিছুটা হলেও গতিহারা হয়েছে, রাজস্ব ঃ জিডিপি অনুপাত নেমেছে আট (৮) এর ঘরে। বেসরকারী খাতে ঋণ প্রবাহ সর্বনিম্ন ৬.৭ ভাগে নেমেছে। এসবের মূল কারণ, যারাই ব্যবসায়ী বিনিয়োগকারী তাদের অনেকেই ব্যাংক মালিক ও বটেন। এই অশুভ সিন্ডিকেট ভাঙা সম্ভব, উচিৎ এবং জরুরী। প্রয়োজন রাজনৈতিক কৃতসংকল্পতা এবং জাতীয় সদিচ্ছা। তবে সুদ মওকুফ করে দেবার অর্থনৈতিক কর্মকান্ড অবিলম্বে বন্ধ করা কাম্য। বলা বাহুল্য বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় ব্যাংকিং খাতের অসামান্য অবদানকে খাটো করে দেখার উপায় নেই।

চ. কেন দশ বছরে ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতি হতে পারে!

গণতান্ত্রিক সমতাপ্রবণ ন্যায়ভিত্তিক ও মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ

৬.১ কিছু তুলনামূলক চিত্র

১৯৭২ সনে বাংলাদেশের ১০ (দশ) বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি জিডিপি এখন ৫০৭ বিলিয়ন অর্থাৎ হাফ ট্রিলিয়ন পেরিয়ে। মাথাপিছু আয় ছিল ১০০ মার্কিন ডলার; এখন তা ২৮৬০। গড় আয়ু ছিল ৪৩ বছর এখন তা ৭২.৭। শিক্ষার হার ছিল শতকরা ২৭ ভাগ, এখন তা ৬০ (ষাট) ভাগের বেশী তবে মানের ব্যাপারটি বিপুলভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩.৩৩% এর তুলনায় এখন ১.৩%। শতকরা ৯৩ ভাগ লোক ব্যবহার করছেন পাকা পায়খানা। ১৯৭২ সনে ১ (এক) কোটি টন খাদ্য উৎপাদন হয়েছিল, এখন হয় ৪ (চার) কোটি টনের উপরে। সুপেয় জলের মাছ ও সবজি উৎপাদনে এখন বাংলাদেশ শীর্ষস্থানীয়ের দিকে। ১৯৭২ সনে দারিদ্রসীমার নীচে ৮০ (আশি) ভাগ লোকের বসবাস ছিল; এখন সাম্প্রতিক বৃদ্ধির পরেও তা শতকরা ২৭ ভাগ। বাংলাদেশ জনসংখ্যার বিবেচনায় পৃথিবীর ৮ম বৃহত্তম দেশ; এখানে রেমিটেন্স আসে ৫ম (পঞ্চম) সর্বোচ্চ। ১৯৭২ সনের ৭৫০ মিলিয়ন ডলারের রপ্তানী এখন ৫৫ বিলিয়ন ডলার। অগ্রগতি চলমান। সম্ভাবনা বিপুলতর।

৬.২ তুলনামূলক অর্জন

আমাদের স্বাধীনতা লগ্নে জনসংখ্যা ছিল ৭.৫ (সাড়ে সাত) কোটি আর পাকিস্তানে ৭.০ (সাত) কোটি। পাকিস্তানের জিডিপি বাংলাদেশের তুলনায় শতকরা ৪০ ভাগ বেশী ছিল। এখন বাংলাদেশের জিডিপি পাকিস্তানের চেয়ে শতকরা ২০ ভাগ বেশী। দ্য ইকনোমিস্ট এর মতে ২০১৭ সনেই বাংলাদেশ টপকে যায় পাকিস্তানের মাথাপিছু আয়কে। আইএমএফ বলছে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় এখন ভারতের চেয়ে বেশী। তবে পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটির ভিত্তিতে হিসাব করলে বাংলাদেশে মাথাপিছু জিডিপি ৮৬৭০ ডলার, ভারতে ৯১৮০ ডলার ও পাকিস্তানে ৬৭৭০ ডলার। বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানে আয়, সম্পদ ও সুযোগ বৈষম্য বিরাজমান।

বাংলাদেশে শীর্ষ ০১ (এক) ভাগ লোকের হাতে ১৬.৩ থেকে ২৩ ভাগ জাতীয় আয় রয়েছে, ভারতবর্ষে শীর্ষ ০১ (এক) ভাগ মানুষের হাতে ২২.৫ (সাড়ে বাইশ) ভাগ জাতীয় আয় রয়েছে। পাকিস্তানে শীর্ষ ০১ (এক) ভাগ মানুষের হাতে রয়েছে জাতীয় আয়ের শতকরা ২১ ভাগ।

৬.৩ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতি

জন্মের প্রথম দু'বছর ছাড়া বাংলাদেশের সমষ্টিক আয়ে প্রবৃদ্ধি একমুখী কেবলই ইতিবাচক। এখন প্রধান কাজ হচ্ছে ঃ স্বাধীনতা প্রসূত সমৃদ্ধির সবচেয়ে বেশী লাভবান হয়েছেন যারা সেই শিল্পপতি-ব্যবসায়ী-ব্যাংক মালিকগণকে কর প্রদানের যৌক্তিকতা দ্বারা উদ্বুদ্ধ করে কর রাজস্বে বিপুল প্রবৃদ্ধি আনা যাতে ২০২৬-২৭ সনের বাজেটে উল্লেখ করা বিনিয়োগ ঃ জিডিপি হার শতকরা ৪০ ভাগে উন্নীত করা যায়। তাছাড়া ইনক্রিমেন্টাল ক্যাপিটাল আউটপুট রেশিও (আইকোর) যা এককালে ৪ (চার) এর নীচে ছিল কিন্তু ২০২৪-২৫ সনে ৬.৪ এ উঠে যায় এবং ২০২৫-২৬ এ ৫.৪ এ উন্নীত হয়। এটিকে আগের অবস্থানে অর্থাৎ আইকোর কে ৪ বা তার কিছু উপরে উন্নীত করতে হলে (১) আইন শৃঙ্খলার উন্নতি, (২) যোগাযোগে বিপুল অগ্রগতি, যেমন রেলের ব্রডগেজে ডাবল লাইনে ব্যাপক প্রসার (৩) প্রশাসনিক দক্ষতা ও প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, (৪) সবচেয়ে বড় কথা সর্বনাশা মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম কমাতে কৃষি উৎপাদন ও বিপননে সমবায়, (৫) নগর অঞ্চলে ট্রাক মাধ্যমে নিত্য ব্যবহার্যের বিক্রি বহুগুণে বৃদ্ধি করা (ফ্যামিলি কার্ড এখানে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা সম্ভব), (৬) আমদানীকারকগণকে বাজার শৃঙ্খলায় আনা এবং (৭) বিদ্যমান অবকাঠামোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা। ১৯৮৩ সনে শুরু করা কর প্রশাসনের অটোমেশনে আর কত দেরী হবে!

বাংলাদেশ ব্যাংককে একটি সাংবিধানিক পদ হিসাবে উন্নীত করে গভর্নরের পদটিকে ছয় বছরের এক মেয়াদী করা সুপারিশ করছি।

আমি মরহুম নেহরীন খানের মতোই আশাবাদী ঃ মানবিক মূল্যবোধ ও সহৃদয় সম্প্রীতির ন্যায়নিষ্ঠ ও সমতাধর্মী বন্টন এবং মমত্ববোধ দিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করে জাতিসংঘের সাস্টেনেইবল ডেভেলপমেন্ট গোলস্, এসডিজির উল্লেখযোগ্য বার্তা "লীভ নোবডি বিহাইন্ড" প্রত্যয়ে একটি গণতান্ত্রিক ও সমতাপ্রবণ সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব। প্রয়োজন সকলেরত ঐকান্তিক প্রচেষ্টা।

East West University

Progoti Foundation for Education and Development
Permanent Sanad Holder
A/2, Jahurul Islam Avenue, Jahurul Islam City, Aftabnagar
Dhaka-1212, Bangladesh

Contact Us

Tel: 09666775577, 9858161 E-mail: admissions@ewubd.edu
URL: https://www.ewubd.edu